বলশেভিক বিপ্লব

ইউনিট ৪

ভূমিকা

রেনেসাঁর প্রভাবে ১৫ শতকে ইউরোপের সমাজ ও অর্থনীতিতে বিশেষ পরিবর্তন দৃষ্টিগোচর হয়। তখন ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলের শহরগুলোকে কেন্দ্র করে ইতালির ব্যবসা-বাণিজ্য বিকাশ লাভ করে। এ নতুন উৎপাদন পদ্ধতি ও সম্পর্কের বিকাশ ইউরোপে প্রতিষ্ঠিত সামন্তবাদী আর্থসামাজিক কাঠামোকে ভেঙে দেয়। ১৫ শতকের শেষ এবং ১৬ শতকের প্রথমার্ধের এসময় ইউরোপের ইতিহাসে প্রাথমিক পুঁজি বিস্তৃতির যুগ হিসেবে চিহ্নিত। তবে ইউরোপে সামন্তবাদ পতনের পটভূমিতে যে আধুনিক পুঁজিবাদী অর্থনীতির বিকাশ ঘটে তার পরিণতিও শুভ হয়নি। তবে ১৬ শতকের মধ্যভাগ থেকে পশ্চিম ইউরোপের ব্যবসা-বাণিজ্যে এগিয়ে থাকা দেশের মধ্যে বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতা চূড়ান্ত রূপ লাভ করে। তবে পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চল অটোমান তুর্কিদের দখলে থাকায় এশিয়ার সাথে বাণিজ্য টিকিয়ে রাখা অসম্ভব হয়ে যায়। এ সময়কালে গুরুত্বপূর্ণ বিশ্বজনীন রাজনৈতিক ঘটনা বলশেভিক বিপ্লব।

	এ ইউনিটের পাঠে আপনি যা জানতে পারবেন

- ✓ পাঠ-৪.১ **সাম্রাজ্যবাদের উত্থান, বিকাশ ও ফলাফল**
- ✓ পাঠ-৪.২ **সাম্রাজ্যবাদের যুগে রাশিয়া**
- ✓ পাঠ-৪.৩ **হবসন ও লেনিনের তত্ত্ব**
- ✓ পাঠ-৪.৪ **বলশেভিক বিপ্লবের কারণ**
- ✓ পাঠ-৪.৪ **বলশেভিক বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহ ও ফলাফল**

পাঠ-৪.১ সাম্রাজ্যবাদের উত্থান, বিকাশ ও ফলাফল

১৮ শতকের শিল্প বিপ্লব ইউরোপের সমাজ ও অর্থনীতিতে এক গুণগত পরিবর্তন সাধন করে। কায়িক-শ্রমের পরিবর্তে যন্ত্রভিত্তিক উৎপাদন প্রক্রিয়া শুরু হয়। বস্তুত এই সময় থেকে পুঁজিবাদের ব্যাপক উত্থান প্রক্রিয়া লক্ষ করা হয়। এর ফলে বাণিজ্য পুঁজির স্থান ক্রমাগত সংকুচিত হয়ে আসতে থাকে এবং শিল্প পুঁজির প্রসার প্রবলভাবে বৃদ্ধি পেতে থাকে। ১৯ শতকের প্রথমার্ধ কাল হলো বাণিজ্য পুঁজি এবং শিল্প পুঁজির মধ্যে সংঘাতের সময়। এই সময়ে বাণিজ্য পুঁজির প্রবক্তারা একচেটিয়া বাণিজ্য এবং অন্যদিকে শিল্প পুঁজির মালিকেরা অবাধ বাণিজ্যের পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করে। ফলে সারা পৃথিবীর ইউরোপীয় উপনিবেশগুলিতে এই দুই ধারার সংঘাত চলতে থাকে।

১৯ শতকের প্রথমদিকে এশিয়া আফ্রিকা ও আমেরিকা মহাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী চেতনার বিকাশ ঘটে। সেখানে ইউরোপের ঔপনিবেশিক শাসন, শোষণ এবং সীমাহীন অত্যাচারের বিরুদ্ধে শুরু হয় স্বাধীনতা অর্জনের লড়াই। ১৮১৫ সালের মধ্যে আমেরিকায় অবস্থিত ফরাসি উপনিবেশগুলো হাতছাড়া হতে থাকে। পরিস্থিতির দায় মেনে নিয়ে ১৮২২ সালে লাতিন আমেরিকার ব্রাজিল থেকে নিয়ন্ত্রণ প্রত্যাহার করে পর্তুগাল। এরপর ১৮৫২ সালে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডিজরেলি ক্রমান্বয়ে ব্রিটিশ উপনিবেশগুলোকে স্বাধীনতা প্রদানের ঘোষণা করেন। ১৮৬১ সালে এসে ফরাসি সরকারও ঘোষণা দিয়ে তাদের উপনিবেশে নিয়ন্ত্রণ শিথিল করে। তারা এ সব অঞ্চলে অবাধ বাণিজ্য নিশ্চিত করে। সে হিসেবে উনিশ শতকের প্রথম ভাগ পশ্চিম ইউরোপের উপনিবেশগুলোর থেকে নিয়ন্ত্রণ হারানোর যুগ শুরু হয়।

নানা স্থানে অবস্থিত উপনিবেশগুলোতে প্রশাসনিক শিথিলতা ছিল সাময়িক ব্যাপার। তখন পুরো ইউরোপে বাণিজ্য পুঁজির স্থান দখল করে নেয় শিল্প পুঁজি। ইউরোপের প্রায় প্রত্যেকটি দেশে শিল্প পুঁজির প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। এর সঙ্গে সঙ্গে নতুন বাজার তৈরি ও কাঁচামাল সংগ্রহের প্রয়োজনে নতুন দেশ দখল করাটা ইউরোপীয়দের স্বভাবে পরিণত হয়। তাদের নতুনভাবে সাম্রাজ্য গড়ে তোলার এ পর্বকে ইতিহাসে সাম্রাজ্যবাদী যুগ বলে ইতিহাসে চিহ্নিত করা হয়। তাদের হিসেবে ১৮৭০ সাল থেকে শুরু করে প্রথম মহাযুদ্ধের সময় পর্যন্ত ইতিহাসের পাতায় সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের যুগ হিসেবে চিহ্নিত। আর পরপর দুটি বিশ্বযুদ্ধ এ ব্যাপারে বিশেষ ভূমিকা রেখেছে। তবে সাম্রাজ্যবাদী এ চেতনা বিভিন্ন ক্ষেত্রে তার রূপ পাল্টে আবার নতুন করে ফিরে আসতে চেয়েছে। নতুন করে সাম্রাজ্যবাদ ঘুরে দাঁড়ানোর এ চেষ্টা বিশ্ব শান্তিকে ঠেলে দিয়েছে হুমকির মুখে। বিশেষ করে একের পর এক নতুন ভূখণ্ড দখলের চেষ্টা সহজে কোনো জাতি মেনে নিতে রাজি হয়নি। তারা যখনি এর বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তুলতে চেয়েছে তখনি বেঁধেছে দীর্ঘস্থায়ী বিপত্তি। আর দুর্বল দেশগুলো যাদের প্রতিরোধ গড়ে তোলার মত ক্ষমতা ছিল না তাদেরকে নির্বিচারে গ্রাস করেছে শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলো।

সাম্রাজ্যবাদের বিকাশ

বিশ্বের বিভিন্ন স্থানে অনেকটা কাছাকাছি সময়ে সাম্রাজ্যবাদ বিস্তার লাভ করলেও তার কারণ, ফলাফল ও প্রভাব ভিন্ন ভিন্ন ছিল। বিশেষ করে ভারত উপমহাদেশ, চীন কিংবা আফ্রিকায় ভিন্ন ভিন্ন কারণে সাম্রাজ্যবাদ বিস্তার লাভ করেছিল। সাম্রাজ্যবাদ-পূর্ব সময়কালে মোগল শাসিত ভারতবর্ষে বাণিজ্যিক প্রাধান্য বিস্তার এবং সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করে দুটি ঔপনিবেশিক রাষ্ট্র ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স। স্থায়ী বাণিজ্য কেন্দ্র স্থাপনের ক্ষেত্রে প্রবল লড়াইয়ে অবতীর্ণ হয় দখলদার দেশ দুটি। ১৭৫৭ সালে পলাশীর যুদ্ধের ভেতর দিয়ে বাংলায় ইংরেজদের রাজনৈতিক আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পায়। এদিকে চীনে সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার ঘটে ১৭ শতকে। সেখানে বাণিজ্য বিস্তারে এগিয়ে ছিল পর্তুগিজরা। তারা দক্ষিণ চীনের ম্যাকাও বন্দর দখল করে বাণিজ্য পরিচালনা করে।

ধীরে ধীরে ইংরেজ, ফরাসি ও ডাচ কোম্পানি চীনের সমুদ্র উপকূল ধরে বসতি স্থাপন করে। এরই ধারাবাহিকতায় ক্যান্টন, হংকং, তাইওয়ান প্রভৃতি এলাকায় ইঙ্গ-ফরাসি প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৩৯ সালে চীন সরকার ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সাথে যুদ্ধে পরাজিত হয়ে নানকিংয়ের সন্ধিতে স্বাক্ষর করে। তার শর্তানুযায়ী সমুদ্র উপকূলের পাঁচটি বন্দর ইংরেজ কোম্পানির দখলে চলে যায়। এই সময়ে চীনে ইংরেজদের আফিম ব্যবসা ও আফিম বাণিজ্যের বিরুদ্ধে চীনা জনগণের সংগ্রামের ফলে ঘটে যায় প্রথম ইঙ্গ-চীন যুদ্ধ ও নানকিং সন্ধি। পরিস্থিতি সংঘাতময় হয়ে ওঠে ১৮৫৬ সালের দিকে।

ইংরেজ ও ফরাসি কোম্পানির তাবেদার জনৈক ফরাসি ধর্মযাজককে কৃত অপরাধের জন্য চীন সরকার মৃত্যুদণ্ড প্রদান করে। এর প্রতিবাদে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স যৌথভাবে চীনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইতিহাসে এটাকে দ্বিতীয় চীন যুদ্ধ হিসেবে উল্লেখ করা হয়। তিয়েন্তসিন সন্ধির মাধ্যমে এ যুদ্ধের পরিসমাপ্তি ঘটলেও সন্ধির শর্তানুসারে ক্ষতিগ্রস্ত হয় চীন। উপকূলবর্তী এগারোটি চীনা বন্দরে ইংরেজ ও ফরাসি শক্তির কর্তৃত্ব সুদৃঢ় হয় এ সন্ধির মাধ্যমে। ১৯ শতকের শেষাংশে চীন দখলের জন্য ইউরোপীয় শক্তিগুলোর প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা এর অখণ্ডতাকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়। ঠিক তখনি নতুন করে চীনে বাণিজ্য বিস্তারের চেষ্টা করে যুক্তরাষ্ট্র। যুক্তরাষ্ট্রের এশীয় বাণিজ্যেসমূহ ক্ষতির আশঙ্কা আঁচ করে তাদের সরকার ও ব্যবসায়ীরা বিশাল চীন সাম্রাজ্যের খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাওয়া মেনে নিতে পারেন নি। পরিস্থিতি মোকাবেলায় মার্কিন পররাষ্ট্র সচিব জন হে চীনের অখণ্ডতা বজায় রাখা এবং চীন অঞ্চলে পশ্চিমা দেশগুলোর বাণিজ্য সমঅধিকার প্রতিষ্ঠার একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। প্রস্তাবে ফ্রান্স, ব্রিটেন, স্পেন, ইতালি, পর্তুগালসহ অধিকাংশ ইউরোপীয় দেশ একাত্ম হয়। 'মুক্ত বাণিজ্য দ্বার' নীতি হিসেবে পরিচিত এ চুক্তি বলতে গেলে চীনের সার্বভৌমত্বকে হুমকির মুখে ঠেলে দেয়।

আধুনিক বিশ্বের অর্থনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনার ক্ষেত্রে এই মুক্তদ্বার নীতির বিশেষ গুরুত্ব রয়েছে। বিশেষ করে ১৯০১ সালে গৃহীত এ নীতির মূল লক্ষ্যগুলো পর্যালোচনা করলে বোঝা যায় বিশ্ব রাজনীতিতে এর প্রভাব কেমন ছিল। প্রথমত, এ নীতির মাধ্যমে প্রত্যেকটি পশ্চিমা পুঁজিবাদী দেশ চীনের অখণ্ডতা এবং স্বাধীনতা মেনে নেয়। দ্বিতীয়ত, চীনে বাণিজ্য পরিচালনায় আগ্রহী কিংবা বাণিজ্যরত দেশ ও কোম্পানিগুলোর কাছ থেকে বাণিজ্য শুল্ক আদায় করার সুযোগ পায় চীন সরকার। তৃতীয়ত, চীনে সব পশ্চিমা দেশ বাণিজ্যের ক্ষেত্রে সমান অধিকার লাভ করে তবে বাণিজ্য ক্ষেত্রে একই নীতি অনুসরণে বাধ্য থাকে তারা। চতুর্থত, চীন সরকার সব দেশ ও বাণিজ্যিক কোম্পানির জন্য সমানুপাতিক হারে শুল্ক ধার্য করে। এ শুল্ক আদায়ে সবার প্রতি একই নীতি অনুসৃত হয়। পঞ্চমত, বাণিজ্য পরিচালনা করতে গিয়ে চীনের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে কোনো প্রকার হস্তক্ষেপ না করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পাশাপাশি চীনের অভ্যন্তরে খ্রিস্টান মিশনারিদের ধর্মান্তর করণের অবৈধ তৎপরতাকেও প্রবলভাবে বাধা প্রদান করা হয় এ নীতির মাধ্যমে। আর যাই হোক এ মুক্তদ্বার নীতি চীনের অখণ্ডতা বজায় রাখতে পেরেছিল। তবে দেশটি সাম্রাজ্যবাদের অবাধ বিচরণ ক্ষেত্রে পরিণত হয়ে সব ধরনের শিল্প বাণিজ্যের নিয়ন্ত্রণ চলে যায় পুঁজিবাদী দেশগুলোর নিয়ন্ত্রণে। এতে করে নাম মাত্র অখণ্ড স্বাধীন দেশ হলেও বাস্তবে তাদের সার্বভৌম ক্ষমতা বলতে আর কিছুই অবশিষ্ট থাকেনি।

দক্ষিণ এশিয়া ও চীনের পর দক্ষিণ পূর্ব এশিয়া তথা প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে বিস্তার লাভ করে সাম্রাজ্যবাদী দেশগুলোর আগ্রাসন নীতি। পশ্চিমে এ অঞ্চলের গুরুত্ব বেড়ে যাওয়ার কারণ হচ্ছে মাঝারি থেকে শুরু করে ভারী শিল্পের কাঁচামাল সমৃদ্ধ এ অঞ্চলের অবস্থান সাগর তীরে। সুয়েজ খাল খননের পরে এই অঞ্চলের সাথে ইউরোপের যোগাযোগ ব্যবস্থা আরো উন্নত হয়। এদিকে দ্বীপরাষ্ট্র শ্রীলঙ্কা প্রথমে পতুর্গিজ ও ওলন্দাজদের দখলে ছিল। তবে সাম্রাজ্যবাদী যুগের সূচনাপর্বেই শ্রীলঙ্কা দখল করে ইংরেজরা। তারা এখানে বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চা উৎপাদন শুরু করলে ক্রমে শ্রীলঙ্কা পৃথিবীতে চা শিল্পে শীর্ষস্থান অর্জন করে। ১৮ শতকের মালয়েশিয়ায় পর্তুগিজ আধিপত্য প্রতিষ্ঠা পেলেও প্রতিযোগিতায় তারা ইংরেজদের কাছে টিকতে পারেনি। সাম্রাজ্যবাদী যুগে এসে মালয়েশিয়াও ইংরেজদের দখলে চলে গেলে দূরপ্রাচ্যের ব্যবসা-বাণিজ্যে তাদের আধিপত্য নিরঙ্কুশ হয়ে ওঠে।

১৮৭০ সালে ওলন্দাজদের জাভা দ্বীপপুঞ্জ অধিকার ও তার ১৬ বছর ব্যবধানে ১৮৮৬ সালে ইংরেজদের বার্মা দখল পরিস্থিতি পুরো পাল্টে দেয়। তারা বার্মাকে ভারতের সাথে সংযুক্ত করলেও থাইল্যান্ড ও আশেপাশের অঞ্চলে কর্তৃত্ব ধরে রেখেছিল ফ্রান্স। তবে ঠিক এই সময়েই যুক্তরাষ্ট্র স্পেনকে তাড়িয়ে ফিলিপাইন দখল করে। এভাবে একের পর এক দখলবাজির মধ্য দিয়েই এগিয়ে যায় সাম্রাজ্যবাদী যুগের ইতিহাস। প্রথম দিকে প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রে ইংরেজদের একাধিপত্য লক্ষ করা গেলেও শেষ পর্যন্ত মার্কিনরা শক্তিমত্তায় এগিয়ে যায়। বলতে গেলে দুটি মহাযুদ্ধের পূর্বে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি প্রায় পুরো পৃথিবীকেই গ্রাস করে নেয়। তবে উনিশ শতকে সাম্রাজ্যবাদ বিস্তৃত হওয়ার পেছনে কয়েকটি বিশেষ কারণ চিহ্নিত করা যায়। তা হচ্ছে–

১. **শিল্প সংরক্ষণ নীতি :** উনিশ শতকের শিল্প বিপ্লব ইউরোপের আর্থ রাজনৈতিক পরিস্থিতি পুরো পাল্টে দিয়েছিল। বিশেষ করে এর ফলেই ইউরোপের শিল্পোন্নত দেশে পুঁজিস্ফীতি ঘটে। তারা পরিস্থিতির দায় ভেবে কঠিন শিল্প সংরক্ষণ নীতি গ্রহণ করেছিল এ সময়ে। তারা বাইরের দেশগুলোর সাথে বাণিজ্যিক প্রতিদ্বন্দ্বিতায় কম গুরুত্ব দিয়ে নিজেদের শিল্প প্রতিষ্ঠান রক্ষার প্রয়াস নেয়। তাদের গৃহীত এ শিল্প সংরক্ষণ নীতি আন্তঃইউরোপীয় বাণিজ্যে সৃষ্টি করে এক অচলাবস্থা। ইউরোপের নানা দেশে পণ্য চলাচল প্রায় বন্ধ হয়। নানা অযুহাতে সুযোগ বুঝে সব ধরনের পণ্যে

পুঁজিপতিদের মূল্যবৃদ্ধির প্রয়াস সবাইকে বিরক্তির শেষ সীমায় নিয়ে যায়। রাজক্ষমতার পৃষ্ঠপোষকতায় অবাধ ও নির্মম শ্রমিক শোষণ পণ্যের অভ্যন্তরীণ বাজারকে ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে এনে দাঁড় করায়। পক্ষান্তরে ১৯ শতকের শেষাংশ পর্যন্ত এশিয়া ও আফ্রিকার দেশগুলো অন্তত শিল্পের দিক থেকে তেমন উন্নতি অর্জন করতে পারেনি। তবে জনবহুল এ অঞ্চল ইউরোপের শিল্প পণ্যের জন্য এক সম্ভাবনাময় বাজার হিসেবে দেখা দেয়। বিশেষ করে নিজেদের শিল্পজাত পণ্যের বাজার সৃষ্টির জন্যই তারা এসব দেশ দখলে আগ্রহী হয়েছিল। কারণ তারা জানতো কোনোভাবে এদেশগুলোর রাজনৈতিক ক্ষমতা দখল করা গেলে আর যাই হোক জোরপূর্বক সেখানে তাদের পণ্য বিক্রির সুযোগ সৃষ্টি হবে। বলতে গেলে অধিক জনসংখ্যার এসব দেশে মুক্ত বাজার সৃষ্টিতেই ইউরোপীয়রা নিজেদের রাজনৈতিক প্রভুত্ব প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয়। আর তার গৌণ প্রভাবে হলেও ধীরে ধীরে সূচনা ও বিস্তার ঘটে সাম্রাজ্যবাদী যুগের।

২. **কাঁচামালের যোগান নিশ্চিতকরণ :** শিল্প বিপ্লব ঘটে যাওয়ার পর ইউরোপের নানা দেশে বিভিন্ন রকমের কলকারখানা প্রতিষ্ঠা পেলেও তার সিংহভাগ কাঁচামাল ইউরোপে পাওয়া সম্ভব হত না। তারা কাঁচামালের জন্য পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল আমেরিকার নানা দেশ, এশিয়া ও আফ্রিকার উপর। ইন্দো-মালয় ও পূর্ব ভারতীয় দ্বীপগুলো ছিল তাদের রাবার সরবরাহ কেন্দ্র। অন্যদিকে বস্ত্রশিল্পের কাঁচামাল তুলা উৎপাদনের কেন্দ্র হিসেবে ভারতবর্ষ এবং মিশরের উষ্ণ আর্দ্র জলবায়ুর এলাকাগুলোকে চিহ্নিত করা যায়। অন্যদিকে আফ্রিকা অঞ্চলের কয়লা, লৌহ, স্বর্ণ, তাম্র এবং মধ্যপ্রাচ্যের তেল ভাণ্ডারও ছিল তাদের শিল্পের বিকাশে অনেক জরুরি। এজন্যও তারা অনেক দেশ দখল করে সাম্রাজ্যবাদের বিস্তার ঘটিয়েছিল।

৩. **খাদ্যশস্যের ক্রমবর্ধমান চাহিদা :** ইউরোপে জনসংখ্যা বেড়ে গেলে সে অনুপাতে খাদ্য উৎপাদন সক্ষমতা বাড়েনি তাদের। ফলে খাদ্যশস্য বিশেষ করে চা, চিনি, তামাক প্রভৃতির জন্য নির্ভরশীলতা বেড়ে যায় তাদের। তারা এশিয়া ও মধ্য আমেরিকা অঞ্চলের উপর এক্ষেত্রে পুরোপুরি নির্ভরশীল ছিল একথা বলা যেতেই পারে। অন্যদিকে ইউরোপের মসলা সরবরাহের জন্য ভারতবর্ষ, বার্মা, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও শ্রীলঙ্কার গুরুত্ব বহুগুণে বেড়ে গেছে ততদিনে। বলতে গেলে খাদ্যশস্যের সরবরাহ অব্যাহত রাখার জন্যও শিল্পোন্নত ইউরোপের দেশগুলো এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন দেশ দখল করে সাম্রাজ্যের বিস্তার ঘটায়।

৪. **সস্তা শ্রমবাজার :** ১৯ শতকে এশিয়া ও আফ্রিকার জনসংখ্যা ছিল বেশি। স্বাভাবিকভাবে এই সুবিধা ইউরোপের চেয়ে এ অঞ্চলের শ্রম বাজার সস্তা ও সহজলভ্য করে দেয়। ইউরোপের শিল্প সংরক্ষণ নীতি এক দেশ থেকে অন্য দেশে শ্রমিক চলাচল সীমিত করে দেয়। ফলে প্রয়োজনীয় বাড়তি শ্রমিকের জন্যই এশিয়া ও আফ্রিকার সস্তা শ্রমবাজারের দিকে আকৃষ্ট হতে হয়েছিল ইউরোপয়ীয় শিল্পপতিদের। এ অবস্থায় শিল্পোন্নত ইউরোপীয় দেশগুলো বেশি মুনাফা লাভের আশায় এশিয়া ও আফ্রিকার নানা অঞ্চলে কয়েকটি শিল্প ইউনিট প্রতিষ্ঠা করে। এর থেকে অর্জিত সাফল্য তাদের অনুপ্রাণিত করে। পরবর্তীকালে তারা এই সস্তা শ্রম বাজার দখলের জন্য মরিয়া হয়ে সাম্রাজ্যবাদী পরিকল্পনার বাস্তবায়নকে ত্বরান্বিত করে। অনেক ক্ষেত্রেই সহজ ও সস্তা শ্রমবাজারের দখল নিতে গিয়ে আরো শক্তিশালী হয়ে ওঠে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। তাদের আগ্রাসী নীতি দেশ বিশেষে ভিন্ন ছিল, কিন্তু উদ্দেশ্যগত দিক থেকে তাদের তেমন কোনো পার্থক্য করার সুযোগ ছিল না।

৫. **উগ্র জাতীয়তাবাদ :** জার্মানি ও ইতালির উগ্র জাতীয়তাবাদী আচরণ ১৯ শতকে এসে ভয়াবহ রূপ লাভ করে। তারা অর্থ, বিত্ত, প্রভাব-প্রতিপত্তি ও শিক্ষায় নিজেদের আফ্রিকা, এশিয়া ও এর বাইরের জাতি থেকে শ্রেষ্ঠ ভাবতে থাকে। তাই রাষ্ট্রীয় মর্যাদা বৃদ্ধি এবং নিজেদের শ্রেষ্ঠ জাতি হিসেবে প্রতিষ্ঠা করার অপচেষ্টায় লিপ্ত হয় তারা। এক্ষেত্রে বিশ্বজুড়ে নানা অঞ্চল দখলের মনোবৃত্তি তাদের মাঝে প্রবল হয়ে উঠে। জার্মান ও ইতালির এই উগ্র জাতীয়তাবাদী ভাবধারা সাম্রাজ্যবাদকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করেছিল নিঃসন্দেহে। তবে দেশ ও অঞ্চল দখলের পৈশাচিকতায় বদলে যায় সবার রাজনৈতিক ধারা। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরাজিত শক্তি হিসেবে জার্মানিকে যেভাবে উপস্থাপন করা হয়, আগ্রাসী নীতির ক্ষেত্রে ইউরোপের অন্যদেশগুলোও কোনো অংশে পিছিয়ে ছিল না।

৬. **সামরিক দিক :** আধুনিক যুগের শুরু থেকেই ইউরোপের অভ্যন্তরীণ রাজনীতি সংঘাতপূর্ণ হয়ে ওঠে। সামরিক শক্তি বৃদ্ধি করা না গেলে এই সময়ের ইউরোপে টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়তো যেকোনো দেশের জন্যই। এ জন্য তারা নিজ সামরিক শক্তি বৃদ্ধিকল্পে বহুমুখী চেষ্টা চালায়। এরফলেই জার্মানি, ফ্রান্স, ইতালি ও ব্রিটেন প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতায়

অবতীর্ণ হয়। তবে এ দেশগুলোর জনসংখ্যা কম বলে আফ্রিকা ও এশিয়ার দেশ থেকে সামরিক বাহিনীর সদস্য সংগ্রহেরও প্রয়োজন পড়ে অনেক ক্ষেত্রে। এক্ষেত্রে সামরিক শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ এবং সামরিক বাহিনীর সদস্য সংগ্রহের উদ্দেশ্যেই পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলো এশিয়া আফ্রিকার অনেক দেশ দখল করে নেয়। একই সঙ্গে সামরিক ঘাঁটি প্রতিষ্ঠা করে গড়ে তোলে স্ব স্ব সামরিক কমাণ্ড। তবে সাম্রাজ্যবাদী যুগের চূড়ান্ত বিকাশ বলা যায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধের মধ্য দিয়ে। এরপর এ সংঘাতের রেশ টিকে থাকে পুরো বিশ শতকজুড়েই।

সাম্রাজ্যবাদের ফলাফল

ঔপনিবেশিক আধিপত্য শেষ হলে সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা ইউরোপের মানচিত্র বদলে দিতে সহায়তা করে। উনিশ শতকের সত্তর দশক থেকে সাম্রাজ্যবাদের উদ্ভব পৃথিবীর ইতিহাস নতুন করে লিখতে বাধ্য করেছে। শোষণের ধারাবাহিকতা অব্যাহত থাকলেও কার্যত সাম্রাজ্যবাদী চিন্তা এবং এর বিকাশ ঘটে বিভিন্ন ধরনের রূপান্তরের মধ্য দিয়ে। এর ফলাফল ছিল তাই বিস্তৃত ও সুদূরপ্রসারী। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে–

১. **শিল্পের বিকাশ :** ইউরোপের পুঁজিপতিরা অধিক মুনাফার জন্য দখলকৃত বা সাম্রাজ্যভুক্ত অঞ্চলসমূহে কিছু নতুন ধরনের শিল্প কারখানা স্থাপন করেছিল। তারা এগুলো নিজেদের মুনাফার জন্য করলেও এর মধ্য দিয়ে আফ্রিকা ও এশিয়ার ইতিহাসে শিল্পের নবজাগরণ ঘটে। বিশেষ করে উপনিবেশ যেমন তাদের কোম্পানি স্বার্থ টিকিয়ে রাখতে গিয়ে মসলিনের মত ঐতিহ্যবাহী শিল্প ধ্বংস করেছে সে হিসেবে সাম্রাজ্যবাদী যুগে কিছু কিছু নতুন অর্জন লক্ষ করা গিয়েছে। পরিস্থিতি বিশেষে সেটা ছিল উপনিবেশ যুগের থেকে পুরোপুরিই ভিন্ন। বিশেষত, ভারতে পাট ও বস্ত্রশিল্পের বিকাশ অনেকাংশে সাম্রাজ্যবাদী যুগের অবদান বলা যেতেই পারে।

২. **যাতায়াত ব্যবস্থার উন্নয়ন :** সাম্রাজ্যবাদী শক্তি তাদের প্রয়োজনীয় শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ ত্বরান্বিত করার উদ্দেশ্যেই বিভিন্ন দেশে প্রতিষ্ঠা করে উন্নত যাতায়াত ব্যবস্থা। তাদের প্রয়োজনে কাঁচামাল সরবরাহের গতিকে দ্রুততর করার জন্য যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়ন ঘটালেও তা টিকে যায় বছরের পর বছর। বিশেষ করে অনুন্নত দেশেও প্রত্যন্ত অঞ্চলের সাথে বন্দরগুলোকে সম্পৃক্ত করা হয়। বিভিন্ন স্থানজুড়ে শক্তিশালী রেললাইন স্থাপন করা হয়। বলতে গেলে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে আধুনিক যোগাযোগ ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে এ সময়টাতেই। বিশেষত, ভারতবর্ষ, চীন, বার্মা, জাভা, মালয়েশিয়া ও চীনের যাতায়াত ব্যবস্থা উন্নয়নে সাম্রাজ্যবাদী যুগের ভূমিকা রয়েছে।

৩. **শিক্ষার উন্নয়ন :** প্রশাসন পরিচালনার জন্য প্রয়োজনীয় শিক্ষিত জনবল গড়ে তোলা ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের জন্য অন্যতম চ্যালেঞ্জ। এক্ষেত্রে তাদেরকে নির্ভর করতে হয় দখলকৃত অঞ্চলের বিশাল অশিক্ষিত ও অর্ধশিক্ষিত জনগোষ্ঠীর উপর। এক্ষেত্রে দখলকৃত অঞ্চল থেকেই তাদের প্রয়োজনীয় জনবল সৃষ্টির জন্য পশ্চিমা দেশগুলো প্রবর্তন করে নতুন নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান। এশিয়ার ইতিহাসে এভাবেই শুরু হয় তাদের ভাষায় আধুনিক শিক্ষার অভিযাত্রা। বাস্তবে এর মধ্যে দিয়েই সৃষ্টি হয় সাম্রাজ্যবাদ নির্ভর ইংরেজি ও ইউরোপীয় ভাবধারার পোষ্য শিক্ষিত শ্রেণি। সাম্রাজ্যবাদীদের কাছে শিক্ষা নিয়ে এরাই কালক্রমে হয়ে ওঠে সাম্রাজ্যবাদের রক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক।

৪. **কৃষির বিকাশ :** শিল্পের অনেক কাঁচামাল ছিল কৃষিনির্ভর। তাই সাম্রাজ্যবাদীরা শিল্পের কাঁচামাল ও খাদ্যশস্য সরবরাহ নিশ্চিত করতে গিয়ে অনেকটা তাদের প্রয়োজনেই এশিয়ার বিভিন্ন দেশে কৃষির বিকাশ ঘটায়। এক্ষেত্রে তাদের পাশাপাশি উপকৃত হয় স্থানীয়রাও। বিশেষ করে এশিয়ার বিভিন্ন দেশে তুলা, রাবার, মসলা, চা, পাট উৎপাদন এবং আধুনিক বনায়ন তাদের কৃষি নীতির অবদান। অনেক ক্ষেত্রে জবরদস্তিমূলক কৃষি উৎপাদন করতে গিয়ে স্থানীয় কৃষির অনেক ক্ষতিসাধনও করেছে। তারা এসব দেশে সেই ধরনের পণ্য উৎপাদনেই বেশি আগ্রহ দেখাতো যেগুলো তাদের প্রয়োজন ছিল। এতে করে প্রচলিত সনাতন পদ্ধতির চাষবাস ও শস্যগুলো হারিয়ে যেতে থাকে কৃষি থেকে।

৫. **সাংস্কৃতিক পরিবর্তন :** সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আগ্রাসন একটি দেশের সংস্কৃতিকে নানা দিক থেকে পাল্টে দেয়। মানুষের আচার আচরণ, পোশাক আশাক এমনকি খাদ্যাভাসের উপর পর্যন্ত প্রভাব বিস্তার করে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি। তবে পরিস্থিতির দায় হিসেবে এটা মেনে নিতেই হবে যে এশিয়া অঞ্চল ইউরোপীয় শক্তির সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারের পটভূমিতে ইউরোপের শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিকাশ ঘটে।

৬. **বিচার ও প্রশাসন :** নিজেদের প্রয়োজনেই বিচার ও প্রশাসনিক ব্যবস্থাকে তাদের মত করে ঢেলে সাজায় সাম্রাজ্যবাদী গোষ্ঠী। বিশেষ করে শিক্ষিত শ্রেণির একাংশ সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অনুগত হলেও অন্য অংশ বিদেশি

শাসনের অবসান কল্পে উদ্যোগী হয়ে উঠেছিল তখন। এ পটভূমিতে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে আধুনিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের উন্মেষ ও বিকাশ ঘটে। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর সারা এশিয়া অঞ্চলে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন উত্তাল আকার ধারণ করে। বিপ্লবীদের দমন করার জন্য বিশেষ আইনের প্রয়োজন ছিল। এই আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যেই তারা বিচার ব্যবস্থা ও প্রশাসনিক কাঠামোতে নানা ধরনের সংস্কার ঘটায়।

পাঠ-৪.২ সাম্রাজ্যবাদের যুগে রাশিয়া

১৯ শতকে রুশ সাম্রাজ্যের বিশাল ভূখণ্ডে ছিল বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠী, সংস্কৃতি ও ধর্মাবলম্বী মানুষের বসবাস। মধ্য এশিয়া থেকে সাইবেরিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত বিশাল ভূভাগের অধিবাসীরা যেমন ছিল মোঙ্গলীয় জাতির। তেমনি তাদের বেশিরভাগই বৌদ্ধ ও ইসলাম ধর্মের অনুসারী বলে জানা যায়। দক্ষিণে ক্রিমিয়া ও মধ্য এশিয়ার বিশাল ভূখণ্ডে ছিল তাতার জাতির আবাস। এরা ইসলাম ধর্মাবলম্বী হলেও মুখ্যত রুশ জনগোষ্ঠী ছিল শ্লাভ জাতির অন্তর্ভুক্ত। ধর্মের দিক থেকে শ্লাভদের সিংহভাগ গ্রিক চার্চের অনুসারী। পক্ষান্তরে লিথুনিয়া ও ইউক্রেন অঞ্চলে পোলিশদের আবাসস্থল। আদি নিবাস পোল্যান্ড হলেও এরা রুশদের সমগোত্রীয় এবং রোমান ক্যাথলিক চার্চের অনুগত ছিল। তাদের সাথে বাল্টিক অঞ্চলের প্রোটেস্ট্যান্টদের সম্পর্ক তেমন ভালো ছিল না।

সামাজিক স্তরবিন্যাস বিচার করতে গেলে ১৯ শতকের রাশিয়ায় দুটি শ্রেণির অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়; অভিজাত শ্রেণি এবং ভূমিদাস। রাষ্ট্রের সকল ক্ষমতার অধিকারী এবং সমুদয় সম্পদের মালিক অভিজাত শ্রেণি ভোগ করত বেশিরভাগ সুযোগ-সুবিধা। এদিকে ভূমিদাস নিয়ন্ত্রণের জন্য গঠন করা হয় বিশেষ সংস্থা 'মির'। দাসদের বসবাস করতে হতো বহুমুখী বিধিনিষেধ এবং প্রত্যক্ষ নিয়ন্ত্রণের মধ্যে। বস্তুত রাশিয়ায় ভূমিদাসরা ছিল জামিদার তথা মালিকদের ব্যক্তিগত সম্পত্তি যেখানে শাসন ব্যবস্থা এবং রাষ্ট্র পরিচালনার গুরুদায়িত্ব জার নিয়ন্ত্রণ করতেন নিজ ক্ষমতাবলে। প্রদেশের শাসন পরিচালনার জন্য একজন গভর্নর এবং একটি কাউন্সিল থাকলেও জারের স্বৈরতন্ত্র ছিল সমাজ ও রাষ্ট্রের প্রচলিত আইন। প্রাদেশিক শাসক নিয়োগ করতেন স্বয়ং জার এবং প্রতিটি স্থানীয় প্রশাসনের পদে বসতো অভিজাত পরিবারের সদস্যরাই। জারের ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করতে ছিল প্রোটিরিয়ান গার্ড বা জারের পুলিশ বাহিনী যারা যে কোনো বিদ্রোহ দমনের জন্য সব সময় প্রস্তুত থাকত।

ইউরোপের যেকোনো দেশের তুলনায় রাশিয়ার সাধারণ মানুষ ছিল অনেক বেশি অত্যাচারিত। সরাসরি জলপথ সংলগ্ন উত্তর মহাসাগর বাদ দিলে বিশাল ভৌগোলিক সীমানায় রাশিয়া একটি স্থলবেষ্টিত দেশ। উত্তর মহাসাগরের জলপথ প্রায় সারা বছর বরফাচ্ছাদিত থাকায় নৌ চলাচলের অযোগ্য। তাই পরিস্থিতির দায় অনেকটা মেনে নিয়েই ১৮ শতকের মাঝামাঝি থেকে রাশিয়ার নেতৃত্ব দুটি জলপথ কাজে লাগাতে চেষ্টা করে। তারা এক্ষেত্রে রাশিয়ার প্রাধান্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে প্রথমে কৃষ্ণসাগর থেকে দার্দানালিস প্রণালির ভেতর দিয়ে ভূমধ্যসাগরে প্রবেশের চেষ্টা করে। তবে দার্দানেলিস প্রণালি তুরস্কের দখলে থাকায় সেদিক দিয়ে ভূমধ্যসাগরে প্রবেশের কোনো সুযোগ রাশিয়ার ছিল না। অন্যদিকে মধ্য এশিয়া অঞ্চল দখল করে ইরানের ভেতর দিয়ে পারস্য উপসাগরে প্রবেশ করার চেষ্টা চালায় তারা। এতে করে ভারত মহাসাগরের সাথে সরাসরি সংযোগ স্থাপনের সুযোগ ছিল। দক্ষিণে সাগর পথে যে কোনো মূল্যে অগ্রসর হয়ে রাশিয়া তাদের জন্য বাণিজ্য পথ তৈরির চেষ্টা চালায়। ইতিহাসবিদ, রাষ্ট্রবিজ্ঞানী ও আন্তর্জাতিক সম্পর্কের বিশ্লেষকগণ তাদের এ প্রয়াসকে 'উষ্ণ পানির নীতি' হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। উসমানীয় তুর্কি সাম্রাজ্যের উপর রাশিয়ার জোরপূর্বক এ দখল নীতিই সৃষ্টি করে উনিশ শতকের কুখ্যাত 'প্রাচ্য সমস্যা'। এসময়ের সামাজিক, অর্থনৈতিক অবস্থা বোঝার পাশাপাশি ও আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট বোঝার জন্য জার প্রথম ও দ্বিতীয় আলেকজান্ডার এবং জার প্রথম নিকোলাসের শাসনামল মূল্যায়ন করাটা জরুরি।

পাঠ-৪.৩ হবসন ও লেনিনের তত্ত্ব

ইউরোপে বিদ্যমান রাজতান্ত্রিক কাঠামো ক্রমশ দুর্বল হয়ে পড়ার পর তাদের আগ্রাসী নীতি সাম্রাজ্যবাদের আকারে নতুন করে ফিরে আসে। পরপর কয়েকটি বিপ্লব সংঘটিত হওয়ার পাশাপাশি রাজতান্ত্রিক কাঠামোর ভেঙে পড়া ইউরোপীয় রাজনীতিতে একটি বদল আসন্ন করে তোলে। এ সময়টিকে ইউরোপের সাম্রাজ্যবাদী যুগ বলে চিহ্নিত করে থাকেন বিভিন্ন ইতিহাসবিদ। প্রখ্যাত ইংরেজ অর্থনীতিবিদ জে এ হবসন এবং সোভিয়েত বলশেভিক বিপ্লবের নেতা ভি আই লেনিন এ সময়কাল সম্পর্কে দুটি বিশেষ তত্ত্ব প্রদান করেছেন। একসাথে তাদের এই বিশ্লেষণমূলক আলোচনা তাদের নামানুসারে হবসন এবং লেনিনের তত্ত্ব হিসেবে পরিচিত।

হবসন মনে করেন ইউরোপে শিল্প পুঁজি বিকাশের এই পর্বে এসে মূলধন স্ফীতি ঘটে যায়। যা পুরো ইউরোপের অর্থনীতির পরিকাঠামো পাল্টে দিতে যথেষ্ট হয়েছিল। উদ্বৃত্ত মূলধনের বিনিয়োগে বেশি মুনাফা অর্জনের জন্য ইউরোপের পুঁজিবাদী দেশগুলো এশিয়া, আমেরিকা ও আফ্রিকার বিস্তীর্ণ অঞ্চল দখল করতে থাকে। তারা এসব দেশ নিজ সাম্রাজ্যভুক্ত করে ব্যাপক দখল ও লুটতরাজ চালায়। মূলধন বিনিয়োগের স্থান হিসেবেও এসব দেশকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করে সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলো। বিশেষ করে সেখানে বিনিয়োগ করার মাধ্যমে স্বল্প খরচে অধিক শ্রমিক নিয়োগের সুযোগ ছিল। এতে করে কম খরচে অধিক উৎপাদন সম্ভব হত তাদের পক্ষে। তারা খুব সহজেই অল্প পরিমাণ অর্থ বিনিয়োগ করে বিশাল অঙ্কের লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। এই অর্থ তারা পৌনঃপুনিকভাবে ব্যবহার করে সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রে। সাম্রাজ্য নিয়ে হবসনের এ তত্ত্বকে সাম্রাজ্যবাদী যুগের বিশ্লেষণে অর্থনৈতিক তত্ত্ব হিসেবে চিহ্নিত করা যেতে পারে।

পুরোপুরি অর্থনীতি নির্ভর না হলেও লেনিনের তত্ত্বেও অর্থনীতির একটি কার্যকর ভূমিকা ছিল। তিনি এ তত্ত্ব উপস্থাপন করার জন্য আশ্রয় করেছেন 'Imperialism is the Highest Stage of Capitalism' নামক গ্রন্থের। তিনি সাম্রাজ্যবাদ বিস্তারকে পুঁজি বিস্তারের সর্বোচ্চ স্তর বলে দাবি করেছেন। পাশাপাশি পুঁজি ও সাম্রাজ্য একে অন্যের পরিপূরক বলেও মনে করেন লেনিন। এক্ষেত্রে স্পষ্টভাবে তিনি বলতে চেয়েছেন যে পুঁজির স্বাভাবিক ধর্ম হচ্ছে দখল আর লুণ্ঠনে তা ব্যাপৃত হয়। এক্ষেত্রে পুঁজিবাদ তার চূড়ান্ত পর্বে নতুন নতুন বাজার খুঁজতে চেষ্টা করে। এক্ষেত্রে নতুন স্থান সন্ধানের বদলে বিভিন্ন এলাকা দখল ও প্রভুত্ব কায়েম মুখ্য হয়ে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে সাম্রাজ্যবাদ এক কথায় পুঁজিবাদ ও তৎসংশ্লিষ্ট অর্থনীতি বিকাশের ধারাবাহিকতা মাত্র। সেদিক থেকে বিচার করলে লেনিনের তত্ত্বটিতে অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক দুটি দিক গুরুত্ব পেয়েছে। পরিস্থিতির সাথে সমন্বয় করে ইতিহাসের কার্যকারণ নির্ভর বিশ্লেষণ করতে গেলে লেনিনের তত্ত্বটিই অধিক বস্তুনিষ্ঠ ও গ্রহণযোগ্যতার দাবি রাখে।

পাঠ-৪.৪ বলশেভিক বিপ্লবের কারণ

জারদের স্বৈরতান্ত্রিক শাসনের যুগের নানা বিচ্ছিন্ন ঘটনাপ্রবাহের মধ্য দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে রাশিয়ার ইতিহাস। সেদিক থেকে দেখলে এ বিপ্লবের সামাজিক পটভূমি তৈরি হয়েছিল ১৯ শতকে এসে। তখনকার ইউরোপে সমাজতন্ত্রবাদের উদ্ভব ও বিকাশ পরিস্থিতি বদলে দেয়। পাশাপাশি ফ্রান্সে বুর্জোয়াদের সফল বিপ্লব নতুন করে ভাবতে শেখায় রাশিয়ানদের। তাদের অনেক তাত্ত্বিক ও সমালোচকের পাশাপাশি বলশেভিক বিপ্লবের নেতারাও ফরাসি বিপ্লবের নানা ত্রুটি শনাক্ত করে তাদের বিপ্লবকে সামনের দিকে এগিয়ে নেয়। তারা পরিস্থিতির দায় মেনে উপযুক্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষম হওয়ায় বিপ্লব সফল করতে তেমন বেগ পায়নি। তবে ঐতিহাসিক এ বিপ্লবের কারণগুলোকে নানা দিক থেকে বিশ্লেষণের প্রয়োজন রয়েছে। যেমন এর গুরুত্বপূর্ণ কারণগুলো হচ্ছে–

সমাজতান্ত্রিক মতবাদ : ইউরোপের নানা স্থানে পুঁজিপতিদের শোষণ অতিক্রম করে মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার নিরন্তর সংগ্রাম, শ্রমিক কল্যাণ, বেকার সমস্যা দূরীকরণ ও দ্রুত নগরায়নের সমস্যা মোকাবেলা করা হয়ে ওঠে অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। শিল্প বিপ্লবোত্তর ইউরোপের সমাজ ও রাজনীতিতে দেখা যায় বহুমুখী উত্থান পতন। তখনকার সমাজ পরিবর্তনের মুখে মানুষের অধিকার রক্ষা, শ্রমিক শ্রেণির কাজের সময়, বেতন ভাতা, ছুটি এবং সর্বোপরি পুঁজির শোষণের বিরুদ্ধে দানা বেঁধে ওঠে তীব্র সামাজিক আন্দোলন যা সমাজতান্ত্রিক মতবাদ প্রতিষ্ঠার পথ করে দেয়। বিশেষ করে ব্রিটিশ সমাজতন্ত্রী চার্লস ওয়েন, ফরাসি সমাজতন্ত্রী সেন্ট সাইমন, চার্লস ফুরিয়্যর, লুই ব্লাঙ্ক, প্রুধোঁ প্রমুখের পাশাপাশি রাশিয়ার সমাজতন্ত্রীরা হয়ে ওঠেন সর্বেসর্বা। তখনকার রাশিয়ায় মিখাইল বাকুনিন কিংবা ক্রপোৎকিন প্রবর্তিত মতাদর্শ রাজনৈতিক পরিসরে অনেক গুরুত্ব লাভ করে।

তত্ত্ব ও কাজের সমন্বয় : বিভিন্ন তাত্ত্বিকের সফল উদ্যোগে তখনকার রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র সহজেই রাজনৈতিক মতাদর্শে পরিণত হয়। তবে ইউরোপের সমাজ ও রাজনীতিতে সমাজতন্ত্রের প্রয়োজনীয়তা গভীরভাবে উপলব্ধি করার পাশাপাশি এর প্রয়োগ করাটা ছিল অনেক বড় চ্যালেঞ্জ। বিশেষ করে পরিসর ও রাজনীতির মতাদর্শের দিক থেকে এর প্রয়োগ, লক্ষ্য নির্ধারণ ও উপযোগিতা নিশ্চিত করাটা সফল বিপ্লবের জন্য জরুরি হয়ে দেখা যায়। বিশেষ কয়েকজন রাজনৈতিক নেতা এসময় অগ্রণী ভূমিকা পালন করে তত্ত্ব ও কাজের সমন্বয় করে দিয়েছিলেন যা বলশেভিক বিপ্লবকে সফল করতে পথ দেখায়।

তাত্ত্বিক উন্নয়ন : অনেক সীমাবদ্ধতা হেতু তাত্ত্বিকদের পক্ষে বিপ্লবের পদ্ধতিগত দিক ও পরিসীমা নির্ধারণ সম্ভব হয়ে ওঠেনি। ফলে প্রাথমিক দিকের সমাজতন্ত্রীদের কাল্পনিক সমাজতন্ত্রী বলা হয়। তাদের সমাজতান্ত্রিক মতবাদের নানা ক্ষেত্রে বাস্তব ও পরিপূর্ণ রূপরেখা, যৌক্তিক প্রয়োগ পদ্ধতি এবং সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনে সফলতা অর্জনের পথ পরিক্রমা নিশ্চিত করেন কার্ল মার্কস। বৈজ্ঞানিক সমাজতন্ত্রের জনক খ্যাত কার্ল মার্কসের নির্দেশিত পথকে সামনে রেখেই ১৯ শতকের শেষদিকে ইউরোপের নানা দেশে গড়ে ওঠে বিভিন্ন ধরনের সমাজতান্ত্রিক দল। বলতে গেলে রাশিয়ার বলশেভিক পার্টি তেমনিভাবেই গড়ে ওঠা একটি রাজনৈতিক দল। এক্ষেত্রে লেনিন মার্কসের নির্দেশিত পথে কাজ করেন বলেই সফলতার মুখ দেখে বলশেভিক আন্দোলন।

রাশিয়ার ভঙ্গুর সমাজ কাঠামো : ১৮ শতক থেকে পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলোয় আর্থসামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনে নানা পরিবর্তন ঘটে। শিক্ষা, সংস্কৃতি, উন্নত জীবনধারা এবং বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিকাশের কেন্দ্রস্থলে পরিণত হয় এ এলাকা। সেদিক থেকে বিচার করতে গেলে রাশিয়ায় জারদের নানা দমননীতি তাদের উন্নয়ন ব্যহত করে। নানা দিক থেকে পিছিয়ে পড়ে তাদের সমাজ কাঠামো একটি ভঙ্গুর অবস্থানে চলে যায়। তারা ইউরোপের সামাজিক বাস্তবতায় একেবারে তলানিতে পড়ে থাকে। উদারনৈতিক চিন্তাধারা, গণতান্ত্রিক রাজনীতি, কল্যাণমুখী প্রশাসন এবং বিজ্ঞানভিত্তিক যুক্তিনির্ভর শিক্ষা ব্যবস্থার কোনো ছাপ ছিল না তখনকার রাশিয়ায়। জারের একনায়কতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা, শোষণ আর অত্যাচার থেকে মুক্তি পেতে সব মানুষের মনে তখন কাজ করে বিশেষ তাড়না। তারা চলমান সামন্ত সমাজ কাঠামো এবং জারের স্বৈরতান্ত্রিক নির্যাতন থেকে মুক্তি পেতেই সংগ্রাম করেছে। সেদিক থেকে ধরলে রাশিয়ার ভঙ্গুর সমাজ কাঠামো বলশেভিক বিপ্লবের পথকে সুগম করেছিল।

জারতন্ত্রের অযোগ্য শাসন : জারতন্ত্রের অযোগ্যতাই রাশিয়ায় বলশেভিক বিপ্লবের পথ সুগম করেছিল। দেশাভ্যন্তরে অত্যাচারী শাসনের বিপরীতে ১৮৫৪-৫৬ সালে ক্রিমিয়ার যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়ে জারতন্ত্র জনগণের আস্থা হারায়। মানুষ তখন থেকে মনেপ্রাণে জারদের ঘৃণা করতে শুরু করে। পক্ষান্তরে ১৯০৫ সালে জাপানের সাথে যুদ্ধে রাশিয়ার পরাজয়

জারদের অবস্থান ভুলুণ্ঠিত করে। অন্যদিকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার সামরিক বিপর্যয় আর অনেক সৈনিকের প্রাণহানিও বিচলিত করে সবাইকে। এসব ঘটনাপ্রবাহ ধারাবাহিকভাবে সাধারণ মানুষের কাছে জারতন্ত্রের অযোগ্যতাকে প্রকট করেছিল। যার পরিপ্রেক্ষিতে রাশিয়ার মানুষ দুর্বল হওয়া সত্ত্বেও অত্যাচারী ও অযোগ্য জারতন্ত্রের অবসানকল্পে বিপ্লবী বলশেভিকদের স্বাগত জানাতে সময় নেয়নি।

শ্রমিক অসন্তোষ : রাশিয়ায় দ্রুত শিল্পায়ন ঘটতে থাকে উনিশ শতকের সত্তরের দশকে এসে। সম্রাট দ্বিতীয় আলেকজান্ডারের শিল্পনীতি এক্ষেত্রে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। রাশিয়ার ভূমিদাস শ্রেণি শিল্পায়নের সাথে সাথে শ্রমিকে রূপান্তরিত হলেও তাদের জীবন ছিল খুবই নিম্নমানের। বেতন ভাতা এবং কাজের সময় নিয়ে কোনো সরকারি নীতিমালা ছিল না। পক্ষান্তরে রাশিয়াতে শ্রমিক ধর্মঘট এবং ট্রেড ইউনিয়ন নিষিদ্ধ থাকার ফলে এরা ছিল চরমভাবে শোষিত এবং নির্যাতিত। ঠিক এমনি পটভূমিতে সমাজতান্ত্রিকরা তাদের সাম্যবাদী মতাদর্শ নিয়ে শ্রমিক শ্রেণিকে রাষ্ট্রক্ষমতা দখলের স্বপ্ন দেখায়। তারা সরাসরি প্রলেতারিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠা, ভূমির উপর সামাজিক মালিকানা আরোপ, কলকারখানা জাতীয়করণ প্রভৃতি বিষয় নিয়ে খুব সহজেই নির্যাতিত শ্রমিকের মনকে দোলা দিতে সক্ষম হয়। বাগ্মী নেতা লেনিনের উপযুক্ত উপস্থাপনা ও নেতৃত্ব শ্রমিক শ্রেণিকে সহজেই আন্দোলনে সম্পৃক্ত করতে সক্ষম হয়। ফলে অসন্তুষ্ট শ্রমিকরাই বিপ্লবী শ্রেণিতে পরিণত হয়ে বলশেভিক বিপ্লবে মূল ভূমিকা পালন করে। এদিক থেকে বিচার করতে গেলে শ্রমিক অসন্তোষই বলশেভিক বিপ্লবের পথ করে দেয়।

সার্ফদের পুনর্বাসন জটিলতা : ভূমিদাসদের দুর্গতি লক্ষ করে জার দ্বিতীয় আলেকজান্ডার এ প্রথার বিলোপ সাধনে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করলেও তা শেষ অবধি ফলপ্রসূ হয়নি। এদিকে ভূমিদাস শ্রেণির দুর্দশা, তাদের উপর অত্যাচার, নির্যাতন প্রভৃতি বেড়ে যায় নানা দিক থেকে। রাশিয়ায় বিদ্যমান সুদীর্ঘ সামাজিক অস্থিরতার এটাও অন্যতম কারণ হয়েছিল। ভূমিদাসরা সামন্ত প্রভুর হাত থেকে গ্রামীণ সংস্থা মীর এর অধীনে ন্যস্ত হলেও তাদের আর্থসামাজিক অবস্থার কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। পশ্চিম ইউরোপের দেশগুলিতে সামন্তবাদ পতনের পটভূমিতে ভূমিদাসরা স্বাধীন কৃষকে পরিণত হয়। তবে রাশিয়ার সমাজে ভূমিদাসরা কৃষকে পরিণত না হয়ে পত্তন করে ভূমিহীন শ্রেণির। আর এজন্যই ১৯ শতকের শেষ এবং ২০ শতকের গোড়ার দিকে রাশিয়ায় শক্তিশালী মধ্যবিত্ত শ্রেণি আত্মপ্রকাশে ব্যর্থ হয়। রাশিয়ার সমাজে একটি অভিজাত, অপরটি ভূমিহীন বরাবরই এ দুটি শ্রেণি বিদ্যমান ছিল। এক্ষেত্রে ১৯ শতকের শেষদিকে একটি সামাজিক পরিসংখ্যানে দেখা যায় রাশিয়ার প্রতি এক হাজার মানুষের মধ্যে মাত্র সতেরো জন অভিজাত শ্রেণির, আর বাকি সবাই ভূমিহীন। সেক্ষেত্রে রাশিয়ার প্রায় পুরো জমিই ছিল রাজপরিবার এবং সামন্ত অভিজাতদের দখলে। এক্ষেত্রে ভূমিহীন শ্রেণির সামাজিক অসন্তোষ, বিদ্রোহ ইত্যাদি বলশেভিক বিপ্লবের পটভূমি প্রস্তুত করে।

লেখক দার্শনিকদের ভূমিকা : বলশেভিক বিপ্লবের বেলায় ১৭৮৯ সালে ফরাসি বিপ্লবের মতই কিছু বিষয় মিলে যায়। সেক্ষেত্রে ফরাসি কবি, লেখক, সাহিত্যিক, দার্শনিক ও অধ্যাপকগণ যেমন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন তেমনি বিষয় লক্ষ করা যায় রাশিয়ার ক্ষেত্রে। জার্মান লেখক কার্ল মার্কসের লেখা বলশেভিক বিপ্লবে বেশ প্রভাব বিস্তার করে। অন্যদিকে রুশ সাহিত্যিক পুসকিন, লিও টলস্টয়, দস্তয়ভস্কি, ইভান তুর্গনেভও জারদের প্রতিবাদ জানাতে থেমে থাকেননি। তাঁদের ক্ষুরধার লেখনীতে জার শাসনের অক্ষমতা, স্বৈরতান্ত্রিক মনোভাব, রাষ্ট্রযন্ত্রের আগ্রাসী রূপ, গণমানুষের উপর শোষণ-নির্যাতন আর নানা অন্যায়ের চিত্র ফুটে উঠতে দেখা যায়। এতে সহজেই সাধারণ মানুষের মাঝে জারবিরোধী মনোভাব বিস্তার লাভ করে। সমকালীন ব্রিটেন ও ফ্রান্সের কবি, দার্শনিক ও সাহিত্যিক রাশিয়ার উদারপন্থী অভিজাত সম্প্রদায়কে সমাজ পরিবর্তনে অনুপ্রাণিত করে। তারাও বলশেভিক বিপ্লব সংগঠনে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছিলেন।

নিহিলিজম ও নারোদনিক আন্দোলন : ১৯ শতকের রাশিয়ায় গড়ে ওঠা বেশ কয়েকটি গুপ্ত সংগঠনের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ছিল নিহিলিজম এবং নারোনিক। এরা জার শাসনের অত্যাচার, শোষণ ও স্বৈরতান্ত্রিকতা থেকে দেশকে মুক্ত করার অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষিত হয়ে মাঠে নামে। তারা নানা দিক থেকে জার বিরোধী অবস্থান নিয়ে সাধারণ মানুষকে মুক্তির পথ দেখায়। অনেক নির্যাতিত মানুষ তাদের দলে গিয়ে যোগদান করে। তারা আর্থসামাজিক মুক্তির আশায় একের পর এক জার বিরোধী কর্মকাণ্ডে আত্মনিয়োগ করে। জার শাসনের চরম দমননীতির মুখে এ দুটি আন্দোলন সন্ত্রাসবাদী চরিত্র নিলে পরিস্থিতি হয়ে যায় আরো ভয়াবহ। তবে জারদের নিষ্ঠুর দমননীতির মুখে এ আন্দোলন ব্যর্থ হলেও মুক্তির সংগ্রামে তাদের প্রয়াস ও আত্মদান সমাজতান্ত্রিক আন্দোলনকে শক্তিশালী করে তোলে। নির্যাতিত রুশ জনগণ মুক্তির দিশারী হিসেবে গ্রহণ করে বলশেভিকদের।

অর্থনৈতিক সংকট : জারদের অপশাসনের মুখে রাশিয়ার অর্থনৈতিক দৈন্য চরমে ওঠে। বলশেভিক বিপ্লবের কারণ হিসেবে তাই এ সংকটকে চিহ্নিত করা যেতেই পারে। জার ও অভিজাত শ্রেণির ভোগবিলাসী জীবন, অর্থনীতিতে পরিকল্পনার অভাব, কৃষিক্ষেত্রে অনুর্বরতা, শিল্পক্ষেত্রে গতিহীন অবস্থান, শ্রমিকদের আন্দোলন ও অসহযোগিতামূলক আচরণ খাদের কিনারে এনে দাঁড় করায় তখনকার রাশিয়াকে। রাষ্ট্রযন্ত্র ক্রমশ জনদলনের হাতিয়ার হিসেবে জনমনে সৃষ্টি করে ত্রাস ও প্রাণভীতি। মানুষ উন্নয়নের স্বপ্নে নতুন করে কাজ করার উদ্যম হারিয়ে ফেলে। মানুষের কর্মহীন অবস্থার পাশাপাশি অপরাধপ্রবণতা বৃদ্ধি অকার্যকর করে তোলে অর্থনীতিকে। দেশের অর্থনৈতিক সংকট সাধারণ মানুষ বিশেষ করে শ্রমিক ও ভূমিদাসদের জীবনকে করে তোলে দুর্বিষহ। এর থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যই রাশিয়ার মানুষ স্বাগত জানায় বলশেভিক বিপ্লবকে ।

প্রথম বিশ্বযুদ্ধের বিপর্যয় : জারের দুঃশাসন আর চরম দমন নীতির বিপরীতে প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার সামরিক বিপর্যয় ঘটে। যুদ্ধে জারের প্রতি জনগণের কোনো সমর্থন না থাকলেও সামরিক বিপর্যয়ের মুখে জার সরকার গ্রামের ভূমিহীন কৃষকদেরকে জোরপূর্বক সেনাবাহিনীতে নিয়োগ করে। তাদের জন্য সামরিক-বাহিনীতে যোগদান বাধ্যতামূলক করা হয়। নানা স্থানের যুদ্ধে রাশিয়ান বাহিনীর বিপর্যয়, সেনাবাহিনীতে অনিয়মিত সরবরাহ, খাদ্য ঘাটতি, কয়লার অভাবে নিষ্ক্রিয় যোগাযোগ ব্যবস্থা রুশ সেনাবাহিনীর মনোবল ভেঙ্গে যায়। সেনাবাহিনীর এবং দেশের এই দুরবস্থার জন্য সাধারণ মানুষ জারকেই দায়ী করে। হাতে অর্থকড়ি না থাকলেও তখন অনেক মানুষের হাতে অস্ত্র চলে যায়। বিশ্বযুদ্ধে সফল না হলেও তারা এসব অস্ত্র এবং অস্ত্রচালনার প্রশিক্ষণকে কাজে লাগায় জারের বিরুদ্ধেই। এ ধরনের অস্ত্রধারী যুদ্ধের প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত সৈনিকরা যখন জারের হাত থেকে দেশকে মুক্ত করাকেই প্রধান কর্তব্য বলে মনে করে তখন সহজেই বিদায় ঘণ্টা বেজে যায় জারতন্ত্রের। পক্ষান্তরে দেশের এমন বিপর্যয়কর পরিস্থিতিতে রাশিয়ার জনগণের পাশাপাশি তারাও লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টিকেই ত্রাণকর্তা জ্ঞান করে। তারা বলশেভিকদের একমাত্র মুক্তিদাতা হিসেবে বিবেচনা করেই লিপ্ত হয় জারবিরোধী বিপ্লবে।

পাঠ-৪.৫ বলশেভিক বিপ্লবের ঘটনাপ্রবাহ ও ফলাফল

আর্থসামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষেত্রে অনেকগুলো কারণ সামনে রেখেই সংঘটিত হয়েছিল বলশেভিক বিপ্লব। বিশেষ করে ২০ শতকের শুরুতে রাশিয়ায় শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণির বিকাশ ঘটে। তারা পশ্চিম ইউরোপের আদলে আধুনিক প্রতিনিধিত্বমূলক শাসনতন্ত্র তথা প্রতিনিধিত্বমূলক জাতীয় পরিষদ, দায়িত্বশীল মন্ত্রিসভা, নাগরিক স্বাধীনতা, সমাজে সমাধিকার, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রভৃতি দাবি করে বসে। এদিকে গণমানুষের ধর্মের স্বাধীনতা, শিক্ষার সুযোগ, দায়িত্বশীল প্রশাসনিক কাঠামোর বিকাশ প্রভৃতি নিয়ে আন্দোলন তুঙ্গে ওঠে। যারা সমাজ সংস্কার ও গণমানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে একটি আধুনিক রাশিয়া নির্মাণ করতে চেয়েছিল খড়গহস্তে তাদের উপর উন্মত্ত হয় রুশ সম্রাট দ্বিতীয় নিকোলাস এবং তাঁর অত্যাচারী মন্ত্রী প্লিভি। তারা প্রগতিশীলদের দাবির বিরুদ্ধে কঠোর নীতি গ্রহণ করে আন্দোলনের উত্তাপ আরো কয়েকগুণ বাড়িয়ে তোলে।

বিপ্লবের নেতৃত্বে লেনিন

১৯০৫ সালে রুশ-জাপান যুদ্ধে জাপানের কাছে শোচনীয়ভাবে পরাজিত হয় রাশিয়া। এ পরাজয় জার শাসনের বিরুদ্ধে দেশকে উত্তাল করে তোলে। বলশেভিক পার্টির নেতৃত্বে রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষক সমাজের এ সময় তুমুল আলোড়ন তুলতে সক্ষম হয় দেশব্যাপী। তাদের ব্যাপক আন্দোলনের মুখে পরিস্থিতি অনেকটা নিয়ন্ত্রণের বাইরে চলে যায়। তখন জার দ্বিতীয় নিকোলাস রাশিয়ার জাতীয় পরিষদ ডুমার অধিবেশন আহ্বান করেন। এখানে পরিস্থিতির দায় বুঝে জারের পক্ষ থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির বেশ কয়েকটি দাবি মেনে নিতে দেখা যায়। এক্ষেত্রে মধ্যবিত্ত শ্রেণি কিছুটা সামাজিক সুবিধা অর্জন করলেও শ্রমিক, কৃষক ও মেহনতী মানুষ তাদের ভাগ্যবদল করতে পারেনি। বাস্তবে তাদের মূল রাজনৈতিক লক্ষ্য অপূরণীয় থেকে যায়।

পোল্যান্ড থেকে রাশিয়ার সেনা বিতাড়ন জার্মানির কাছে কচুকাটা হয়ে লেজ গুটিয়ে পালানো রাশিয়ার জনমনে ধিক্কার ও ঘৃণার প্রহর আরো প্রলম্বিত করে। সাধারণ মানুষ প্রথম বিশ্বযুদ্ধে রাশিয়ার এ সামরিক বিপর্যয়ের জন্য পুরোপুরি জারকে দায়ি করে তাঁর প্রতি বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। এদিকে রাশিয়াজুড়ে তীব্র অর্থনৈতিক সংকট ও খাদ্যের অভাব মানুষকে এনে দাঁড় করায় জীবন-মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে। তারা জীবন বাঁচানোর দায় এবং গণমুক্তির আশায় দেশজুড়ে গণঅভ্যুত্থান ঘটাতে ব্রতী হয়। এসময় নানাস্থানে শ্রমিক ধর্মঘট শুরু হয় এবং কৃষক বিদ্রোহ চারদিকে ছড়িয়ে যায়।

যুদ্ধক্ষেত্রে খাবারের কষ্ট ও মানবেতর জীবনযাপনকারী সৈনিকরাও এবার বেঁকে বসে। তারা সংকটের মুখে কমান্ডারদের আদেশ অমান্য করে। অভাবি নির্যাতিত যেসব কৃষককে জোরপূর্বক দলে দলে সেনাসদস্যে পরিণত করা হয়েছে তারা রণাঙ্গন ছেড়ে এসে এবার শ্রমিক, কৃষকের সাথে যোগ দেয়। এতদিনে জারতন্ত্র ও অভিজাতদের অত্যাচার-নিপীড়নের সব শোধ তোলার জন্য অস্ত্র হাতে উন্মুখ হয় তারা। তাদের উপস্থিতিতে সাহসে বলীয়ান হয়ে আমজনতা পুরো রাশিয়ায় ঘটিয়ে

দেয় এক ব্যাপক অভ্যুত্থান। ১৯১৭ সালের ৮ মার্চে শ্রমিক, আমজনতা আর কৃষকেরা রাস্তায় নেমে এসে দখল নেয় পেত্রোগ্রাদ। জার দ্বিতীয় নিকোলাসের সেনাপতি ইভানভ অনেক কষ্টে পেত্রোগ্রাদ দখল করতে সক্ষম হন। তবে জনগণের দাবির মুখে জার সিংহাসন ত্যাগ করতে বাধ্য হয়েছিলেন। এভাবেই প্রাচীন রোমানভ রাজবংশের অবসানে রুশ বিপ্লবের প্রথম অধ্যায়ের সমাপ্তি ঘটে।

১৯১৭ সালের মার্চে ব্যাপক গণঅভ্যুত্থানের মুখে জারের সিংহাসন ত্যাগ ক্ষমতার রদবদল ঘটায়। তখন একটি বুর্জোয়া বা মধ্যবিত্ত শ্রেণির সরকার গঠিত হয়। দেশের মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রতিনিধিত্বকারী বিভিন্ন প্রগতিশীল মানুষ ও নরমপন্থীদের প্রতিনিধিরাই ছিলেন মন্ত্রিসভার সদস্য। এ মন্ত্রিসভা ক্ষমতা গ্রহণের পরপরই তাদের কর্মসূচি ঘোষণা করে। তারা নির্বাচিত গণপরিষদ, রাশিয়ার জন্য সাংবিধানিক সংস্কার প্রবর্তন, গণপরিষদে দেশের ভূমি সমস্যার সমাধান সংক্রান্ত পদক্ষেপ গ্রহণ, দেশে গণতান্ত্রিক সংসদীয় সরকার প্রতিষ্ঠা, ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকার রক্ষা, সংবাদপত্রের স্বাধীনতা প্রদান, শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে সরকারি হস্তক্ষেপ বন্ধ, ধর্ম ও বাকস্বাধীনতা প্রদান প্রভৃতি বিষয়কে গুরুত্বের সাথে তুলে ধরে। মার্চ বিপ্লব পরবর্তী এ কর্মসূচি অনেকটাই পশ্চিম ইউরোপীয় দেশগুলোর অনুকরণে গৃহীত একটি সংস্কারমূলক পদক্ষেপ। তবে রাশিয়ায় বিদ্যমান আর্থসামাজিক পরিস্থিতিতে এ জাতীয় সংস্কার সময়োপযোগী ছিল না। বিশেষ করে এর সাথে রাশিয়ার শ্রমিক ও কৃষকদের ভাগ্য পরিবর্তনে এর সাথে কোনো সম্পর্ক ছিল না। এর জন্য আরো দীর্ঘ সংগ্রাম প্রয়োজন তা অন্তত একটু দেরিতে হলেও বুঝতে সক্ষম হয় রাশিয়ার কৃষক ও শ্রমিক শ্রেণি।

মার্চ বিপ্লবে কৃষক ও শ্রমিক এ দুই শক্তি মুখ্য ভূমিকা পালন করলেও শেষ পর্যন্ত তাদের অধিকার প্রতিষ্ঠা পায়নি। তবে মার্চ বিপ্লবের এই সাফল্যে বলীয়ান হয়ে নতুন করে জোরালো আন্দোলন গড়ে তোলার পথ পায় তারা। বিশেষ করে কৃষকরা জমি বিতরণের দাবি আরো জোরালো করে। শ্রমিকরা পুঁজিবাদ ধ্বংসের জন্য আপ্রাণ চেষ্টা চালাতে শুরু করে। অধিকার আদায়ে প্রায় মরিয়া শ্রমিক ও কৃষকদের দাবি পূরণে বুর্জোয়া সরকার পুরোপুরি ব্যর্থ হয়। এক্ষেত্রে বিপ্লবের কৌশলগত কারণে বলশেভিক পার্টি বুর্জোয়া শ্রেণিকে সমর্থন দিয়ে বিরাট ভুল করেছিল। তারা ক্ষমতা দখলের জন্যই যে এটা করেছিল এতদিনে প্রমাণ হয়ে যায়।

লেনিন দেখলেন বলশেভিক পার্টির লক্ষ্য যেখানে প্রলেতারিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠা তারা কিভাবে মধ্যবিত্ত আকুতিতে নিজেকে জড়াতে গেলেন? বিষয়টি যখন খুব উদ্বিগ্ন করছে সবাইকে তখন বলশেভিক নেতা লেনিন অবস্থান করছিলেন সুইজারল্যান্ডে। তিনি ১৯১৭ সালের এপ্রিলে দেশে ফিরে বিপ্লবের নেতৃত্ব গ্রহণ করে এই মর্মে ঘোষণা দিয়েছিলেন যে রাশিয়ায় বুর্জোয়া গণতন্ত্রের কোনো প্রয়োজন নেই। তিনি স্পষ্ট করে দেন রাশিয়ার সরকার পরিচালিত হবে শ্রমিক ও কৃষকের দ্বারা। এক্ষেত্রে মার্চ মাসের বুর্জোয়া গণতান্ত্রিক বিপ্লবকে বলশেভিক বিপ্লবের প্রথম পর্যায় হিসেবে চিহ্নিত করতেও ভুল হয়নি তাঁর। তিনি স্পষ্টভাবে ঘোষণা করেন বিপ্লবের চূড়ান্ত স্তর হলো জমিদার ও পুঁজিপতিদের উচ্ছেদ করে আমজনতার অধিকার প্রতিষ্ঠা করা। শুধু এর মাধ্যমেই প্রলেতারিয়েত সরকার প্রতিষ্ঠা এবং কৃষক-শ্রমিকের অধিকার পূরণ সম্ভব হবে বলে মনে করতেন তিনি।

রাশিয়ান সমাজে দীর্ঘকাল ধরে ভারি শিল্পের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা প্রতিষ্ঠা নিয়ে সরকার ও অভিজাতদের মধ্যে টানাপড়েন চলে। পাশাপাশি চাষযোগ্য জমি কৃষকদের কাছে হস্তান্তরের বিষয়টিও ছিল অমীমাংসিত। অন্যদিকে লেনিন চলমান এককেন্দ্রিক ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণের চেষ্টা করেন। এক্ষেত্রে স্থানীয় ক্ষমতা আঞ্চলিক সোভিয়েতের হাতে দেয়ার কথা ঘোষণা করা হয়। তবে ১৯১৭ সালের এপ্রিল-মে মাসে রাশিয়ায় ব্যাপক অরাজকতা দেখা দিলে সব পরিকল্পনা ভেস্তে যায়। তখনকার বুর্জোয়া সরকার প্রায় যুদ্ধকালীন এহেন পরিস্থিতি মোকাবিলায় সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়। দেশের অভ্যন্তরে সব পণ্যের অভাবের পাশাপাশি খাদ্য সংকট তীব্র রূপ নেয়।

পণ্য ও খাদ্যসংকটের মধ্যে মড়ার উপর খাঁড়ার ঘার মত হাজির হয় জার্মান বাহিনী। তারা রাশিয়ার অভ্যন্তরে বিভিন্ন অঞ্চল একের পর দখল করতে থাকে। তাদের আক্রমণে পেত্রোগ্রাদের নিরাপত্তা পর্যন্ত বিপন্ন হয়। এমন সামরিক সংকটের মুখে দেখা দেয় ভয়াবহ সেনাবিদ্রোহ। ফলে একদিকে জার্মান আক্রমণ অন্যদিকে দেশের সেনাবাহিনীর উচ্ছৃঙ্খল আচরণ এর সবই মোকাবিলা করতে হয়েছিল তখনকার বলশেভিক সরকারকে। তবে উপযুক্ত পদ্ধতি অনুসরণ করে এমন পরিস্থিতিতেও বলশেভিকরা বিভিন্ন অঞ্চলের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ ধরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। এ সময়ে লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টির দুই নেতা ট্রটস্কি ও স্টালিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখেন। তাদের যোগ্য নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টির হাজার হাজার সদস্য পুরো রাশিয়ায় নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। তারপর একটি কনভয় পেত্রোগ্রাদের দিকে অগ্রসর হয়। জনগণের সমর্থন লাভ করায়

১৯১৭ সালের ৭ নভেম্বর বলশেভিকরা গুরুত্বপূর্ণ সরকারি স্থাপনাগুলোতে হানা দেয়। তারা বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় ভবন, ব্যাংক, টেলিফোন এক্সচেঞ্জসহ প্রায় সব ধরনের স্থাপনা দখল করে নেয়। তারা পুরো রাষ্ট্রযন্ত্রের উপর নিজেদের নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করে। এরপর লেনিনের নেতৃত্বে বলশেভিক পার্টি সরকার প্রতিষ্ঠার কথা ঘোষণা দেয়।

সারাংশ

পৃথিবীর ইতিহাসে প্রথম সফল সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব হিসেবে বলশেভিকদের কৃতিত্ব অস্বীকার করার সুযোগ নেই। তবে তখনকার রাশিয়ান বাস্তবতায় এটা যতটা কার্যকর ছিল বর্তমান বিশ্ব বাস্তবতায় এর যৌক্তিকতা ও কার্যকর অবস্থান নিয়ে নানা তর্ক উঠেছে। তখন যেভাবে বিপ্লবের ফলে রাশিয়ায় শ্রমিক শ্রেণির বিপ্লবী সরকার প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল তা এখনকার হিসেবে অসম্ভবের পর্যায়ে পড়ে। দীর্ঘদিনের সামন্ত ভূস্বামীদের শোষণ, অত্যাচার এবং পুঁজিপতি শ্রেণির শোষণের অবসানে রাশিয়ায় একটি বিপ্লবের প্রয়োজন ছিল। আর বিপ্লবের সবগুলো চলককে কার্যকর দেখে উপযুক্ত সময়ে উত্থান ঘটেছিল লেনিনের মত যোগ্য নেতার। তিনি সময়ের অপেক্ষায় ছিলেন, আর প্রয়োজনের সময় ব্যাটেবলে সুন্দর সংযোগও ঘটে যায় তার, তারপর ছক্কা। এতে করে বদলে যায় রাশিয়ার সনাতনী সামাজিক সম্পর্ক, প্রশাসনিক কাঠামো, অর্থনৈতিক অবস্থা, সমাজ ব্যবস্থা, ধর্মীয় ও রাষ্ট্রনীতি থেকে শুরু করে আরো কতকিছু। বিশেষ করে পশ্চিম ইউরোপের পুঁজিবাদী সমাজ, সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং রাষ্ট্র ব্যবস্থার উপর চরম আঘাত করে এই বলশেভিক বিপ্লব। প্রকারান্তরে এ বিপ্লবের সফলতা শ্রমিক ও কৃষক সমাজকে শোষণ বঞ্চনার হাত থেকে উদ্ধার করে বিশ্ব জুড়ে সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার লড়াইয়ে আরো অনুপ্রাণিত করে। বলতে গেলে বলশেভিক বিপ্লবের ধারাবাহিকতায় ১৯৪৯ সালে সংঘটিত হয় চৈনিক সমাজতান্ত্রিক বিপ্লব।